১৫ই আগস্ট : শোক সাগরে সোনার বাংলার পথসন্ধান

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের মর্মন্তুদ এবং ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড একটি শোকগাথার মহাকাব্য। সেদিনের সুবহে সাদিকে দেশীয় আন্তর্জাতিক পরাজিত শক্তির এদেশীয় গোলামরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শাহাদত দান করে যে আশায়, তার মূল লক্ষ্যটি অবশ্য বিফলে যায়। বাঙালি জাতি সাময়িকভাবে আশা, ভাষা ও বেঁচে থাকার প্রেরণা হারিয়ে ফেললেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। কিষান কিষানী শ্রমজীবী স্বল্প এবং সম্পদহীন মানুষকেই শেখ মুজিব তাঁর হৃদয়ে পরম সুহৃদ হিসেবে স্থান দিতেন। তাইতো তিনি রাখাল রাজা- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, গণমানুষের সম্মোহনী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবিসংবাদিত নেতা।

চিরনিদ্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা শেখ মুজিবুর রহমান ছোটোবেলা থেকেই অনুকরণীয় আদর্শের মাঝে বেড়ে উঠেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান একজন সৎ, স্বচ্ছ, দয়ালু, সাহসী ও ন্যায়ের পক্ষে অবিচল ব্যক্তি ছিলেন। তার উক্তি, "জনগণের জন্য কাজ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য আদর্শিক লড়াই করে আমার ছেলে তো কোন অন্যায়ই করছে না। এ কারণে তার জেল জরিমানা হলে আমি দুঃখিত না হয়ে গর্বিত হতে পারবো" এ কথা কিশোর মুজিবের বুকে অনেক বল এনে দিয়েছিল। মাতা সায়েরা খাতুন বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার খাতিরে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি; এ থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র মুজিব বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপনার ছবক পান। অন্যতম গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ ও প্রধান শিক্ষক বাবু রাসরঞ্জন সেনগুপ্তর কাছে শেখ মুজিব নীতি কথা, দরিদ্রের প্রতি মমত্ববোধ ও জনসেবার পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সনে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে এলে শেখ মুজিবের দৃঢ়, তেজস্বী ও দুর্বলের পাশে দাঁড়ানোর কৃতসংকল্পতায় আকৃষ্ট হন। শেরে বাংলার কৃষক প্রজাবান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়ন শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করে। এইচ এস সোহরাওয়ার্দী তো তার রাজনীতির দীক্ষা গুরু।

ত্রিশের দশকের শেষাশেষি যুবক মুজিব ব্রতচারী আন্দোলনের মহৎ মর্মবাণীতে মুগ্ধ হন। গুরু সদয় দত্তের বানী চিরন্তনী

"পরহিংসা পরদ্বেষ কভু না এনো মনে, কভু না করিও লোভ তুমি পরধনে"

শেখ মুজিবের মনোজগতে আজীবন দোলা দিয়েছে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্বদেশি আন্দোলনের মাঝে তিনি এদেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখেছিলেন- তবে সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামে নয়। জনগণের সম্মিলিত সুসংগঠিত শক্তির মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে বলেই শেখ মুজিব আজীবন বিশ্বাস করেছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ত্রয়ী নেতৃত্ব মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডেপুটি মেয়র হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী এবং মুখ্য নির্বাহী সুভাষ চন্দ্র বসুর শতভাগ জনদরদি ও অসাম্প্রদায়িক নীতি, "কর্পোরেশনের সকল নিয়োগে শতকরা ৬০ ভাগ পদে মুসলমানদের নেওয়া হবে; এ গ্যারান্টি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে" রাজনীতিক মুজিবের একটি পাথেয় হয়ে থাকে। ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় বুভুক্ষুদের পাশে সর্বাত্মক সাহায্য সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানো এবং ১৯৪৬ সনের ভয়ংকর দাঙ্গার সময় "লড়াই করে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটাবে" বলে তিনি রাজনীতির চলার পথে হাতেকলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

ইসলামীয়া কলেজে- বেকার হোস্টেলে দার্শনিক পণ্ডিত প্রফেসর সাইদুর রহমান ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল বিদগ্ধজন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেমের কাছে শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক ও দরিদ্রবান্ধব মানবিকতার পাঠ রপ্ত করেন। 'দাওয়াল' প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি কৃষি শ্রমিকদের হৃদয়াসনে স্থান করে নেন। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" স্লোগানে শামিল শেখ মুজিব ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে বেনিয়া ইংরেজ শাসন-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানই সমাধান বলে মনে করতেন। তবে লাহোর প্রস্তাব "ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস" এর মাঝে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত পূর্ববাংলা এবং কেবিনেট মিশন পরিকল্পনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় ফেডারেশন বাঙালির আর্থসামাজিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতির আশা ভিন্ন ভিন্ন কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী-কিরণশংকর-শরৎ বসু বৃহত্তর বাংলার প্ল্যানে ভারত, বাংলা ও পাকিস্তান নামের তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হতে হলো না, কারণ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা কথা রাখেননি।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১৫ই আগস্ট : শোক সাগরে... (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

পাঞ্জাবিগোষ্ঠী কর্তৃক পাকিস্তানের সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রথম প্রমাণেই অর্থাৎ সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্টের পর পূর্ববাংলা (ইস্ট বেঙ্গলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট পাকিস্তান করা হয় ১৯৫৬ সনে সংবিধানের মাধ্যমে) সচিবালয়ের দক্ষ ও চৌকষ বাঙালি গোলাম মুরশেদের প্রবীণতাকে ডিঙিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি আজিজ আহমেদকে চিফ সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া থেকে শেখ মুজিবের বুঝতে বাকি থাকে না, "মাউরাদের সাথে বেশিদিন থাকা যাবে না (কে জি মুস্তফা)।" আজিজ আহমেদ বাংলাভাষী মন্ত্রীদের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠাতেন কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষের সম্পদ সমৃদ্ধ পূর্ববাংলাকে শোষণ বঞ্চনায় নিঃশেষ করে দেওয়ার নীল নকশা আরও পরিষ্কার হয় রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সামরিক ও সকল ক্ষেত্রের বরাদ্দে পূর্ববাংলাকে মাত্র ১৫-২০% হিস্যা দেওয়ার মাধ্যমে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাঙালি দোসর তথা খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুর রহমান প্রমুখের মাধ্যমে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধুই উর্দু হবে" সিদ্ধান্ত ছাড়াও আরবি অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৪৮ সনের মার্চে ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সনের ২৩শে জুন পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে শেখ মুজিব স্বায়ত্বশাসন তথা স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলন সংগ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পেয়ে যান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রামের দুই পুরোধা অলি আহাদ ও গাজীউল হক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছেন, "১১ই মার্চ ১৯৪৮ সনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার স্বপক্ষে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আন্দোলন, প্রসেশন, পিকেটিংএ মুজিব ভাই নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন দানা বাঁধতো না"। ১৯৫৫ সনে পাকিস্তান গণপরিষদের ৩৫ বছর বয়সি টগবগে সাহসী সদস্য স্পিকারের উদ্দেশ্যে বলেন, "মাননীয় স্পিকার, আমরা লক্ষ্য করছি আপনার লোকজন আমাদের পূর্বপাকিস্তানি বলে চিহ্নিত করে। কক্ষনো না। আমরা পূর্ববাংলা থেকে এসেছি। আমাদের নিজস্ব বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। নামসহ এর কোন পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই বাঙালিদের মতামত আগে নিতে হবে" (ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ঃ দ্য কোয়ালিশন ইয়ারস)। পূর্ববাংলার স্বাধীনতার লড়াই শুরু করার মুজিবীয় বীজ এখানেই প্রোথিত হয়।

দেশ ও মানুষের শান্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন জাতির পিতা

স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে কৃতসংকল্প থেকেও শেখ মুজিব মাঝে মাঝে পথ এবং কৌশল পাল্টাতেন। ষাটের দশকের শুরুতে আগড়তলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্র সিনহার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সাথে মতবিনিময় করেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা ও লন্ডনে প্রবাসী সরকার গঠনের পরিকল্পনা বাদ দেন। তৈরি করেন বাংলার মুক্তিসনদ ছ'দফা; এর উচ্চকণ্ঠ ঘোষণা দেন পাঞ্জাবিদের হৃৎপিন্ড লাহোরে ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সনে। স্বায়ত্বশাসন-স্বাধিকারের আড়ালে ঐ ছ'দফা প্রোগ্রামে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাই নিহিত ছিল বুঝতে পেরে পাকিস্তানিরা ভড়কে যায়। মুজিব দমন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। রুজু করা হয় আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা। গর্জে উঠে বাংলার ছাত্র-জনতা। উনসত্তরের বিপুল শক্তি গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে খান খান হয়ে যায় আয়ুব খানের তখতে তাউস। ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে জেলের তালা ভেঙে মুক্ত করে আনা শেখ মুজিবুর রহমানকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে "বঙ্গবন্ধু" অভিধায় শক্তিমান করে।

স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের খায়েশ তিনি পাকিস্তানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবেন। বঙ্গবন্ধু ও তার আওয়ামী লীগ ছাড়া যে পাকিস্তানের কোনো নির্বাচনই গ্রহণযোগ্য হবে না তা তিনি বুঝতে পারেন। ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোটের লোভনীয় প্রস্তাবসহ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) অধীনে সত্তরের নির্বাচন ডাকেন। বঙ্গবন্ধু সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা কালে নিশ্চিন্ত ছিলেন তার আজীবনের নিঃস্বার্থ সেবা ও জনদরদে সম্পৃক্ত ছ'দফা বাঙালিরা গ্রহণ করেছেন- তাই "ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট" ফর্মুলায় শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ তাকে জয়ী করবেই। ইয়াহিয়াকে লোভনীয় টোপ দিলেন, "ভুট্টোর পরিবর্তে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তিনিই হবেন।" কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৬২/৩০০ নিয়ে ভূমিধস বিজয় লাভ করলে ইয়াহিয়া খান ভড়কে গিয়ে ভুট্টোর ক্যাম্পে হিজরত করতে বাধ্য হন।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইম এর সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অতঃপর গৌরবে উজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ - বঙ্গবন্ধুর নামে, শানে, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় (যদিও তিনি তখন পাকিস্তানি কারাগারে) এলো বহুমূল্যে কেনা বাংলার স্বাধীনতা। দামাল ছেলেমেয়ে, মুক্তিফৌজ ও ডানে বামে পেছনে থাকা আপামর বাঙালি সর্বাত্তকরণ সমর্থনে দখলদার বাহিনী পরাজিত হলো। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় দিবসে বাংলাদেশের পরম মিত্র ও মহৎ প্রতিবেশী ভারত কর্তৃক সবরকমের সাহায্য সহযোগিতা দানকারী বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি পরাজিত বাহিনী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষী থাকেন বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি বিমানবাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকার।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু বীরের বেশে ফিরে এলেন তার সৃষ্টি করা স্বাধীন বাংলাদেশে। বিমানবন্দর থেকে ৩২ নম্বরে পরিবার পরিজনদের অপেক্ষমান রেখে চলে গেলেন রেসকোর্স ময়দানে, "ভায়েরা আমার" যেখানে অপেক্ষমান। একমুঠো বাংলার মাটি কপালে স্পর্শ করিয়ে নম্রকণ্ঠে বললেন তিনি খুবই খুশি স্বাধীন বাংলায় তথা জনমানুষের কাছে ফিরে এসে। কৃতজ্ঞ জাতি তাদের রাষ্ট্র, পরিচয় ও প্রথমবারের মতো বাংলাভাষী বাঙালিদ্বারা স্বাধীনতা এনে দেওয়ার কাণ্ডারি মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নেয়। তবে জাতির পিতা স্মরণ করিয়ে দেন যে যদি স্বাধীন বাংলাদেশে একটি লোকও না খেয়ে মারা যান অথবা আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাহীন থাকেন তাহলে তার জীবনসাধনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।

নিন্দুকেরা যাই বলুক, তিন বছর সাত মাসের শাসনকালে জাতির পিতা অত্যন্ত সফলভাবে একটি ছিন্নমূল জাতির লণ্ডভণ্ড করে দেওয়া অর্থনীতির পুনরুত্থান ঘটিয়ে স্বয়ম্ভর অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবার মতো কার্যকর শাসন ব্যবস্থা চালু ও পরিচালনা করেন। নয় মাসের মাথায় একটি আধুনিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও সমতা নিশ্চিতকারী সংবিধান প্রণয়ন করেন। চমৎকারভাবে প্রণীত নিম্নবিত্ত মানববান্ধব পাঁচশালা পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) অধীনে দারিদ্র্য নির্মূল, কৃষিতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন, শিল্প বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পের উত্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতি মাধ্যমে পরিকল্পিত পরিকল্পনার মাঝেও নিয়ামক পরিমণ্ডলে বাজার অর্থনীতির প্রসার ঘটানোর সুদূরপ্রসারী পথনির্দেশ দেওয়া হয়। শহরে গ্রামে নারীতে পুরুষে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণের অঙ্গীকার করা হয়। প্রয়োজনবোধে বিত্তবানদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করে গরিব কিষান কিষানি ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে সমবায় ও অন্যান্য উদ্ভাবনী উপায়ে অর্থনীতি সমাজনীতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর পথে আনেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৪-৭৫ সনে সমষ্টিক অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৮ ভাগে উঠে যায়। অনুন্নত দেশকে জাতির পিতা ১৯৭৫ সনে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেন। ৮৫ মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় ১৭০ ডলারে উন্নীত হয়।

"সবার সাথে সখ্য, কারও সাথে বৈরী নয়" বলিষ্ঠ নীতির ফলে বিশ্বসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে নিয়ে যান। দ্রুতগতিতে আসতে থাকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি; ঘটে জাতিসংঘের সদস্যপদ। ১৯৭৪ সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বে জুলুমে অত্যাচারিত বৈষম্যের কষাঘাতে রিক্ত মানুষের পক্ষে যে যুগান্তকারী ভাষণ দেন তাতে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হয়ে উঠে। নবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন লিখলেন, "বর্তমান যুগের ইতিহাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জন্ম একটি বিরাট ঘটনা।.... সুচিন্তিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব, শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রমাণ সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির অধিনায়ক ও বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবজাতির পথ প্রদর্শক ও মহান নেতা।"

ব্যক্তি জীবনে সহজসরল সুস্থ চিন্তা পূর্ণ সততার অধিকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষকে বুকে টেনে নেওয়ার সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলের ছাত্র শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের বড়ো ছেলে শেখ মুজিব ওরফে খোকা উচ্চারণ করেছিলেন, "যখনই আমি দুঃখী ভাই বোনের মুখে হাসি দেখি তখনই মনে হয় আমার জীবন সার্থক"। সেই সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিক নির্দেশনা ও উদাহরণ বঙ্গবন্ধু নিজেই। এখন তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার রক্তের ঋণ শোধ করার যে সর্বব্যাপী বিশাল কর্মযজ্ঞ জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছেন তার পূর্ণ বাস্তবায়নই হবে ১৫ই আগস্টের শোক মহাসাগরের উপযুক্ত জবাব। ❑

লেখক: বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব।